জানাযা দর্পণ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ জানাযার নামাযের পদ্ধতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

জানাযার নামাযের পদ্ধতি

জানাযার নামায ৪, ৫, ৬, ৭, ও ৯ তকবীরে পড়া বিধেয়। এর প্রত্যেকটিই নবী (ﷺ) হতে সহীহ-সূত্রে প্রমাণিত আছে। সুতরাং যে কোন একটি হাদীসের উপর আমল করলে সুন্নত পালন হয়ে যায়। তবে সব রকম তকবীরের উপর কখনো কখনো আমল করাই উচিত। যাতে সমস্ত সহীহ হাদীসের উপর আমল বজায় থাকে। আর যদি এক ধরনের আমল রাখতেই হয়, তাহলে চার তকবীরের উপর আমল রাখা যায়। কারণ, চার তকবীরে জানাযা বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে সবার চেয়ে বেশী। (দেখুন, আহকামুল জানাই ১১১ পৃঃ)।

এবারে জানাযার নামাযের পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

নামাযী সর্ব প্রথম প্রস্তুতি নিয়ে দাড়িয়ে মনে মনে জানাযার নামাযের নিয়ত করবে। (প্রকাশ যে, বাধা-গড়া নিয়ত পড়া বা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বিদআত।)

অতঃপর অন্যান্য নামাযের মতই তার উভয় হাত কানের উপরিভাগ অথবা কাঁধ বরাবর তুলবে। আর এর সাথে আল্লা-হু আকবার” বলে তকবীর দেবে। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর স্থাপন করবে। আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক জানাযার নামায পড়াকালে তকবীর দিলেন এবং প্রথম তকবীরের সময় তার উভয় হাতকে তুললেন। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন।” (তিরমিযী ১৯৭নং, সহীহ তিরমিযী ৮৫৯নং)

অতঃপর ‘আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ’ পড়ে সুরা ফাতেহা পাঠ করবে। অতঃপর ‘বিসমিল্লাহ” বলে একটি (ছোট) সুরা পাঠ করবে।

তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন আউফ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পশ্চাতে এক জানাযার নামায পড়লাম। তিনি উচ্চস্বরে আমাদেরকে শুনিয়ে সুরা ফাতেহা ও একটি অন্য সুরা পাঠ করলেন। অতঃপর নামায শেষ করলে আমি তার হাতে ধরে (উচ্চস্বরে পড়ার কারণ) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, 'আমি উচ্চস্বরে এই জন্যই পড়লাম; যাতে তোমরা জানতে পার যে, উক্ত সূরা পাঠ সুন্নাহ (নবী (ﷺ) এর তরীকা) ও হক (সত্য)। (বুখারী ১২৪৯, আকদাউদ ২৭৮৩ক, তিরমিযী ৯৪৭, ৯৪৮ক, নাসাঈ ১৯৬ ১ক ইবনুল জারুন, মুনতাফা ২৬৪নং)

সুতরাং উভয় সূরা চুপে-চুপে পড়াই সুন্নাহ। তাই আবু উমামাহ সাহলও বলেন, জানাযার নামাযে সুন্নাহ হল, প্রথম তকবীরের পর নিশ্চুপে সুরা ফাতেহা পাঠ করা। অতঃপর তিন তকবীর দেওয়া এবং শেষে সালাম ফেরা। (নাসাঈ ১৯৬৩ক)

অবশ্য শিক্ষাদান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে পড়া দোষাবহ নয়। যেমন ইবনে আব্বাস (রাঃ) পড়েছিলেন। যেমন নবী (ﷺ) জানাযার দুআ উচ্চস্বরে পড়েছেন। যা শুনে সাহাবাগণ মুখস্থ করেছেন। উক্ত কিরাআতে সংক্ষিপ্ত সুরা পড়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, জানাযা সমস্ত কাজই তড়িঘড়ির উপর সমাধা করা কর্তব্য। আর এ জন্যই এ নামাযে

ইস্তিফতাহর দুআ পাঠ বিধেয় নয়। (সাবউনা সুআলান ১২পৃঃ)

ছোট একটি সুরা পাঠ শেষ হলে নামাযী দ্বিতীয় তকবীর দেবে। এই তকবীর এবং এর পরের তকবীরগুলোতে হাত তোলার প্রসঙ্গে নবী (ﷺ) হতে কিছু প্রমাণিত নেই। আর প্রথম তকবীর ছাড়া অন্যান্য তকবীরের সময় তিনি হাত তুলতেন না বলে যে হাদীস আছে, তা শুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে ইবনে উমার, ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তাঁরা সকল তকবীরে হাত তুলতেন। (নাইলুল আউতার ৪/৬২) অতএব সাহাবাদের এই আমলকে সুন্নাহ ধরে নিয়ে প্রত্যেক তকবীরের সময় হাত তোলা উত্তম বলা যায়। কারণ, তারা নবী (ﷺ) কে অনুরূপ হাত তুলতে দেখেছেন বলেই তাদের আমল ঐরূপ ছিল। নচেৎ উক্ত আমল তাঁদের নিজস্ব ইজতিহাদও বলা যায় না। তবে যদি এ কথা কেউ না মানেন, তাহলে হাত না তোলাতেও কোন দোষ নেই।

অতঃপর নামাযী বুকের উপর হাত রেখে নবী (ﷺ) এর উপর দরূদ পাঠ করবে। সেই ইব্রাহীমী দরূদ পাঠ করবে যা নামাযের তাশাহহুদে পাঠ করা হয়ে। থাকে। (দেখুন, বাইহাকী ৪/৩৯, ইবনুল জারূদ ২৬৫ নং, প্রমুখ।)

অতঃপর তৃতীয় তকবীর বলে (দুই হাত না তুলে অথবা তুলে পুনরায় হাত বুকে রেখে) মাইয়্যেতের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে ও আন্তরিকতার সাথে দুআ করবে। প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, ‘‘যখন তোমরা মাইয়্যেতের জানাযা পড়বে তখন তার জন্য বিশুদ্ধচিত্তে দুআ করবে।’’ (আবু দাউদ ২৭৮৪ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮৬)।

সেই দুআ পাঠ করবে যা মহানবী (ﷺ) হতে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। যেমনঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিহাইয়িনা অমাইয়িতিনা অশা-হিদিনা অগায়িবিনা অস্বাগীরিনা অকাবীরিনা অযাকারিনা অউনষা-না, আল্লা-হুম্মা মান আহয়্যাইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, অমান তাওয়াফফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফফাহু আলাল ঈমান, আল্লা-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহু অলা তাফতিন্না বাদাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত-মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট-বড়, পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর জীবিত রাখ এবং যাকে মরণ দিবে তাকে ঈমানের উপর মরণ দাও। হে আল্লাহ! ওর সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদেরকে ফিতনায় ফেলো না। (সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫২ আহমাদ ২/৩৬৮, তিরমিযী ৯৪৫ক, নাসাঈ ১৯৬০ক, আহমাদ ১৬৮৮৫ক, আবু দাউদ ২৭৮৬ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮৬ক, মিশকাত ১৬৭৫নং) কোন কোন বর্ণনায় দুআর শেষে ‘‘অলা তাফতিন্নার পরিবর্তে ‘‘অলা তুযিল্লানা বা'দাহ’’ (অর্থাৎ, ওরপর আমাদেরকে ভ্রষ্ট করো না।) বর্ণিত আছে।

প্রকাশ যে, এই দুআটি সকল শ্রেণীর মুর্দার জন্য পড়া চলে।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লাহু অরহামহু অআ-ফিহী অ'ফু আনহু অআকরিম নুযুলাহু অঅসসি’ মুদখালাহু,

অগসিলহু বিলমা-ই অসসালজি অল-বারাদ। অনাক্কিহী মিনাল খাত্বায়্যা কামা য়ুনাক্কাস সাউবুল আবয়্যাযু মিনাদ দানাস। অ আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহী অ আহলান খাইরাম মিন আহলিহী অযাওজান খাইরাম মিন যাওজিহ। অ আদখিলহুল জান্নাতা অ আইযহু মিন আযা-বিল ক্বাবরি অ আযা-বিন্নার।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও এবং ওকে রহম কর। ওকে নিরাপত্তা দাও এবং মার্জনা করে দাও, ওর মেহেমানী সম্মানজনক কর এবং ওর প্রবেশস্থল প্রশস্ত কর। ওকে তুমি পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও এবং ওকে গোনাহ থেকে এমন পরিষ্কার কর যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। আর ওকে তুমি ওর ঘর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঘর, ওর পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার, ওর জুড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ী দান কর। ওকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবর ও দোযখের আযাব থেকে রেহাই দাও।

বর্ণনাকারী সাহাবী আউফ বিন মালেক বলেন, (আল্লাহর রসূল (ﷺ)–কে যখন এই দুআ বলতে শুনলাম) তখন আমি এই কামনা করলাম যে, যদি আমি এই মাইয়্যেত হতাম! (মুসলিম ১৬০০ক, তিরমিযী ৯৪৬ক, নাসাঈ ১৯৫৭ক, ইবনে মাজাহ ১৪৮১ক, আহমাদ ২২৮৫০ক)

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দুআটি পুরুষ মাইয়্যেতের জন্য ব্যবহৃত। কারণ, নবী (ﷺ) পুরুষের জন্যই পড়েছিলেন। মহিলার জন্যও পড়া বৈধ। তবে এ ক্ষেত্রে যদি তার স্বামী বেদীন হয় তবেই পূর্ণ দুআ বলা যাবে। নচেৎ “অযাউজান খাইরাম মিন যাওজিহ” (অর্থাৎ ওর পার্থিব জুড়ি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জুড়ি দান কর) বাক্যটি বাদ দিয়ে পড়তে হবে। কারণ, স্বামী নেক হলে এবং উভয়ে জান্নাতে গেলে স্ত্রী উক্ত স্বামীরই অধিকারে থাকবে। (আল-বিজাযাহ)

স্বামী নেক হলে উক্ত দুআয় উক্ত বাক্য বলার সময় এই অর্থ নিলেও পূর্ণ দুআ পড়া যায়; অর্থাৎ, “বর্তমানে ওর স্বামী যে গুণ ও চরিত্রে আছে বা ছিল আখেরাতে তার চাইতে আরো উৎকৃষ্ট গুণ ও চরিত্রবান করে দিও।” (দেখুন, আশারহুল মুমতে ইবনে উষাইমীন ৫/৪১২)

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলা-নাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা অহাবলি জিওয়ারিক, ফাক্বিহী ফিতনাতাল ক্বাবরি অ আযা-বান্নার, অ আন্তা আহলুল অফা-ই অলহাক্ব, ফাগফির লাহু অরহামহু ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় অমুকের পুত্র অমুক তোমার দায়িত্বে এবং তোমার আমানতে। অতএব ওকে তুমি কবর ও দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি বিশ্বাস ও ন্যায়ের পাত্র। সুতরাং ওকে তুমি মাফ করে দাও এবং ওর প্রতি দয়া । কর। নিঃসন্দেহে তুমিই মহাক্ষমাশীল অতি দয়াবান। (সহীহ ইবনে মাজাহ ১/২৫১, আবু দাউদ ৩/ ২১১, আবু দাউদ ৩২০৩ক, ইবনে মাজাহ ১৪৯৯, ইবনে হিব্বান ৫৭৮নং, আহমাদ ৩/৪৭১, সহীহ আবু দাউদ ২৭৪২নং)

اللهم عبدك وابن امتك احتاج الى رحمتك وأنت غني عن عذابه إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه

উচ্চারণঃ- “আল্লা-হুম্মা আবদুকা অবনু আমাতিকাহতাজা ইলা রাহমাতিক, অআন্তা গানিইয়্যুন আন আযা-বিহ, ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানা-তিহ, অইন কা-না মুসীআন ফাতাজা-অয আহ। ”

অর্থ-হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর পুত্র তোমার রহমতের মুখাপেক্ষী এবং তুমি ওকে আযাব

দেওয়া থেকে বেপরোয়া। যদি ও নেক হয় তবে ওর নেকী আরো বৃদ্ধি কর। আর যদি গোনাহগার হয় তবে ওকে ক্ষমা কর। (হাকেম ১/৩৫৯, ত্বাবারনীর কাবীর)

আফযল হল, প্রত্যেক জানাযায় একই ধরনের দুআ না পড়া। বরং এক এক জানাযায় এক এক দুআ বদলে বদলে পড়া। কারণ, নবী (ﷺ) অনুরূপ করেছেন। এতে সমস্ত হাদীসের উপর আমল হবে।

মাইয়্যেত শিশু হলে প্রথমোক্ত দুআ করবে। কারণ, তা সকলের জন্য সাধারণ। তবে কিছু সলফে সালেহ শিশুর জানাযায় নিম্নের দুআ পাঠ করতেনঃ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطاً، وَسَلَفاً، وَأَجْراً

উচ্চারণঃ-আল্লা-হুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বাউ অ সালাফাউ অ আজরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি ওকে আমাদের জন্য অগ্রগামী (জান্নাতে পূর্বপ্রস্তুতিস্বরূপ ব্যবস্থাকারী) এবং সওয়াব বানাও। (শরহুস সুন্নাহ ৫/৩৫৭, বাইহাকী বুখারী বিনা সনদে ফাতহুল বারী ৩/২৪২, নাইলুল আউতার ৪/৬৪)।

অবশ্য শিশুর জন্য দুআ করার সময় তার পিতা-মাতার জন্যও ক্ষমা ও রহমতের দুআ করা বিধেয়। (সহীহ আবু দাউদ ২৭২৩নং)

মাইয়্যেত মহিলা হলে দুআর শব্দগুলিতে ‘হু’ সর্বনামের স্থলে ‘হা’ আবদ’ এর স্থলে ‘আমাহ’ ‘বিন’ এর স্থলে ‘বিনত’, ‘ফুলান’ এর স্থলে ‘ফুলানাহ’, বাবহার করতে হবে। একাধিক মাইয়্যেত হলে ঐ শব্দগুলির বহুবচন ব্যবহারই ভাষার দাবী। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত দুআটির প্রয়োগ যথাবিহিত। (আলমুমতে, ইবনে উষাইমীন ৫/৪১৪, আল বিজাযাহ ৯২পৃঃ)।

দুআ শেষ হলে (হাত তুলে) চতুর্থ তকবীর দিয়ে বুকে হাত রাখবে। অতঃপর নীরব থেকে একটু অপেক্ষা করবে। (অবশ্য এ তকবীরের পরেও দুআ পড়ার কথা প্রমাণিত।) (দেখুন, বাইহাকী ৪/৩৫, হাকেম ১/৩৬০, আহমাদ ৪/৩৮৩, ইবনে মাজাহ ১৫০৩নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১২২০নং)

অতঃপর অন্যান্য নামাযে সালাম ফেরার মত ডাইনে ও বামে উভয় দিকে সালাম ফিরবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, তিনটি কাজ আল্লাহর রসূল (ﷺ) করতেন কিন্তু লোকেরা তা বর্জন করেছে; এর মধ্যে একটি হল (অন্যান্য) নামাযের মত জানাযার নামাযে সালাম ফেরা।' (বাইহাকী ৪/৪৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ৩/৩৪}

অবশ্য এক দিকে (কেবল ডাইনে) সালাম ফেরাও যথেষ্ট। কারণ, আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) এক জানাযার নামায পড়লেন। তিনি। তাতে চার তকবীর দিলেন এবং শেষে একটি মাত্র সালাম ফিরলেন।” (দেখুন, দারাকুতুনী ১৯ ১নং, হাকেম ১/৩৬০, বাইহাকী ৪/৪৩)।

মুক্তাদী হলে এবং ইমাম উচ্চস্বরে কিরাআত পড়লে সুরা ফাতিহা পাঠ করবে। আর অন্য একটি সূরা পাঠ না করে ইমামের কিরাআত শুনবে।

পাঁচ বা তার অধিক তকবীর দিয়ে জানাযা পড়লে উল্লিখিত দুআগুলির মধ্য হতে চতুর্থ ও তার পরের তকবীরগুলির পরে এক একটি করে পড়া যায়। (সাবউনা সুআলান ৭পৃঃ)

জানাযার নামাযে কেউ মসবুক হলে (অর্থাৎ, দেরীতে পৌছে ২/১ তকবীর ছুটে গেলে) ইমামের সাথে জামাআতে শামিল হবে। যতটা পাবে ততটা পড়ে নিয়ে বাকী কাযা করতে হবে। কারণ, মহানবী (ﷺ) এর সাধারণ হাদীস

এই যে, “তোমরা জামাআতের সাথে যেটুকু নামায পাও তা পড়ে নাও এবং যতটুকু ছুটে যায় ততটুকু পুরো করে নাও।” (বুখারী ৬৩৫নং, মুসলিম ৬০২নং) সুতরাং ইমাম সালাম ফিরে দিলে এবং লাশ তোলা না হলে বাকী তকবীর পুরো করে নেবে। নচেৎ লাশ তুলে নেওয়ার আশঙ্কা থাকলে পুরো করতেও পারে নতুবা ইমামের সাথেই সালাম ফিরতে পারে। (ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৬৫, সাবউনা সুআলান ১৩ঃ)।

জানাযার নামায শুরু হয়ে যাওয়ার পর যদি ওযু করতে যাওয়া যায়, তাহলে নামায ছুটে যাবে। তবুও এ ক্ষেত্রে ওযু না করে তায়াম্মু করে নামাযে শামিল হওয়ার অনুমতি যথার্থ নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা তায়াম্মুমের অনুমতি দিয়েছেন কেবল পানি না পাওয়া বা ব্যবহারে সমর্থ না হওয়ার ক্ষেত্রে। তিনি বলেন,

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

অর্থাৎ, পানি না পেলে তায়াম্মুম কর। (সুরা নিসা ৪৩ আয়াত)

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্র অর্জনের সামগ্রী করা হয়েছে যখন আমরা পানি পাব না।” (মুসলিম ৫২২নং)

অতএব উক্ত ক্ষেত্রে পানি মজুদ থাকার কারণে জামাআত ছুটার ভয়ে তায়াম্মুম বৈধ ও শুদ্ধ নয়। আর ওয়াজেব হল সাধারণ উক্তির উপর আমল করা। অবশ্য খাস বা নির্দিষ্ট হওয়ার দলীল পাওয়া গেলে সে কথা ভিন্ন। পরন্তু এখানে খাস করার কোন নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। (ফতহুল বারীরর টীকা ৩/২২৮)

নামায শেষ হওয়ার পর যদি কোন জামাআত (একাধিক লোক) আসে তবে দাফন না হয়ে থাকলে তারাও জামাআত করে লাশকে সামনে রেখে অনুরূপ জানাযা পড়বে। দাফন হয়ে গিয়ে থাকলে কবরকে সামনে করে জানাযা পড়বে। কারণ নবী (ﷺ) হতে কবরের উপর জানাযার নামায পড়া প্রমাণিত। (সাবউনা সুআলান ১৯পৃঃ)

জানাযার নামাযই মাইয়্যেতের জন্য দুআ। সুতরাং এরপর পুনরায় হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত বিদআত।

এই স্থানে মড়া-বাড়ির তরফ হতে সাধারণভাবে গ্রাম ও আত্মীয়-স্বজনকে (ওলীমার মত) দাওয়াত দেওয়া এবং আত্মীয়দের সেই দাওয়াত গ্রহণ করা বিধেয় নয় বরং তা বড় বিদআত। (মু’জামুল বিদা ১৬৩পৃঃ) বিধেয় হল কোন আত্মীয় অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে মড়া-বাড়ির লোকেদের জন্যই পেট ভরার মত খানা-পিনা প্রস্তুত করে পাঠানো। আব্দুল্লাহ বিন জাফর বলেন, জাফর (রাঃ) শহীদ হওয়ার পর যখন তাঁর সে খবর পৌঁছল, তখন নবী (ﷺ) বললেন, “জাফরের পরিজনের জন্য তোমরা খানা প্রস্তুত কর। কারণ, ওদের নিকট এমন খবর পৌঁছেছে; যা ওদেরকে বিভোর করে রাখবে।” (আবু দাউদ ৩ ১৩২নং, তিরমিযী ৯৯৮নং, ইবনে মাজাহ ১৬১০নংপ্রমুখ সহীহ আবু দাউদ ১৫৮৬নং)

সাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, দাফনের পর মড়া বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) (আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)

কি যে সমাজে সে সহানুভুতি ও সহায়তা নেই, সেখানে কি হবে? বদনাম নেওয়া ভালো হবে, নাকি জাহেলিয়াতি কর্ম?

পক্ষান্তরে খাবারের ব্যবস্থা না হলে নিজেদের তথা দূরবর্তী মেহেমানদের (যাদের সেদিন বাড়ি ফিরা অসম্ভব তাদের) জন্য তো নাচারে ডালভাত করতেই হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সুনামের লোভে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাছ-মাংসের

ভোজবাজিতে আত্মীয় স্বজন, জানাযার কর্মী (?!) মাদ্রাসার স্টাফ ও ছাত্রবৃন্দ (!) পাড়াপ্রতিবেশী এবং কখনো বা গোটা গ্রামকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তা পরমানন্দে খাওয়াও হয়, তথা কিছুতে একটু লবণ কম হলে দুর্নাম করতেও কুসুর হয় না। এমন ভোজবাজি যে জাহেলিয়াত থেকেও নিকৃষ্টতর তাতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে কি?

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12145

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন